সুখপাঠ

Author

আজমিরা খাতুন

আজমিরা খাতুন ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে আবুল বাশারের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করছেন।

আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক : আবুল বাশার

আজমিরা খাতুন

আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক : আবুল বাশার

আজমিরা খাতুন

আমি যে উপন্যাস লিখেছি, 'বাহিরা' নামে, সেটাও নায়িকাপ্রধান। এখানে আমার কথা আছে। কিছু কিছু মেয়েদের দেখছি আমি, যে মেয়েদের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। মেয়েরা জাগবে। শুধু জাগবে না, জেগে উঠেছে। জেগে গেছে।

আরও পড়ুন

আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক : আবুল বাশার

তিনি নিবিড়ভাবে জানেন মুসলিম জীবনচর্যা। তাঁর লেখার কাহিনি বিন্যাসে মিলেমিশে যায় মিথ এবং ধর্মতত্ত্ব। সাধারণ মানুষের জীবনবোধ রূপান্তরিত হয় দার্শনিকতায়। বিশেষ করে সমাজে মেয়েদের অবস্থান, তাদের অসহায়তা, তাদের অধিকার, স্বাতন্ত্র ও মর্যাদাবোধের আখ্যান তিনি লিখে চলেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। লেখার বিষয় যখন রাজনীতি তখন তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট। যৌনতাকে বিষয় করে তাঁর কলম ঋজু। তাঁর লেখা তাই কখনও বিতর্কিত, কখনও বহু আলোচিত। এই সাক্ষাৎকারেও অকপট সাহিত্যিক **আবুল বাশার**। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আজমিরা খাতুন।

প্রশ্ন : আপনার জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা সম্বন্ধে জানতে চাই।

উত্তর : আমার জন্ম ১৯৫১ সালে। জন্মস্থান নতুন হাসানপুর। মুর্শিদাবাদ জেলা, লালবাগ মহকুমায়। আমার জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটো গ্রাম। একটা জন্ম-গ্রাম আর একটা বসত-গ্রাম। জন্ম-গ্রাম ছিল নতুন হাসানপুর। আর বসত-গ্রাম ছিল টেঁকারাইপুর। যাকে অনেকে বলত টেকা। টেঁকা কথা থেকে টেকা কথাটি এসেছে। এই টেঁকাই হল রাই সরষের রাই, পদবি নয়। নদীর বাঁককে মুর্শিদাবাদে টেঁক বলত। আবার টেঁক বলতে অঙ্কুরও বোঝায়।

আমার বয়স যখন ছ'বছর তখন আমার বাবা-মা আমার জন্ম-গ্রাম নতুন হাসানপুর ছেড়ে দুটো নদী পেরিয়ে— একটা ছোট নদী আর একটা বড় নদী— বড় নদী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। আমার গ্রামের পিছনের দিকেও একটা নদী আছে। যার ফলে নদী অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় আমার লেখায় বার বার নদী এসেছে। তিনটে নদী জড়িয়ে আছে আমার শৈশবের সঙ্গে। এছাড়া পদ্মাও আছে, ভৈরব নদী বড় নদী, একটা ছোট নদী আছে, যার নাম ছোট নদী। নদীটা এতটাই ছোট ছিল যে মাঝে মাঝে মনে হতে এক লাফে পার হয়ে যাওয়া যাবে। কখনও কখনও লাফিয়েছিও কিন্তু ওপারে জলের কিনারে গিয়ে পড়ে যেতাম। এই ছোট নদীর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। নদীকে বাদ দিয়ে আমার সাহিত্যের আলোচনা হয় না।

প্রশ্ন : আপনার একটা উপন্যাস আছে 'জল মাটি আগুনের উপাখ্যান'। সেখানে নদীর কথা রয়েছে।

উত্তর : হ্যাঁ, ওটা ওই দুই নদীকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আমি এখন যেখানে থাকি, এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার নদীগুলি সামুদ্রিক আর আমাদের নদী ছিল পার্বত্য নদী। মূলত বর্ষার জলের নদী। পর্বত থেকে নেমে এসেছে। গঙ্গাই হচ্ছে মূল উৎস। গঙ্গার একপাশ দিয়ে ভৈরব নদী আর একপাশ দিয়ে পদ্মা নদী বেরিয়েছে।

প্রশ্ন : মুর্শিদাবাদে আপনার বাড়ির কাছাকাছি গোমোহনী নামে নদী আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, ওটা আমার বসত-গ্রামের পিছনের নদী। ওটা ছোট নদীর তুলনায় দ্বিগুণ-তিনগুণ। যদিও লোকে ওই নদীকে বলে গোমানী, তবে আমার ধারণা ওটার গোমোহনী নাম। আমি নিজেই এই নামটা ব্যবহার করি। ওটার যদি গোমানী নাম থেকেও থাকে তবুও আমি ওই নদীকে গোমোহনীই বলি। গোরু যেখানে একটা নদীর মোহনায় এসে ভিড় করে।

আমার একটা গল্প আছে যেখানে দেখানো হয়েছে, একটা মাছরাঙা খুবই সুন্দর দেখতে, সে কুমের ওপর বসে আছে, নিজের খসে যাওয়া একটা পালক মুখে নিয়ে। সেটা মাছরাঙা বা হলুদ পাখি ছিল, যার সমস্ত গা হলুদ। কাঁচা সোনার মতো। সে তার একটা খসে যাওয়া সুন্দর পালক মুখে নিয়ে বসে আছে। এই কুম হল নদীর বুকে খুঁড়ে রাখা গর্ত। এই গর্ত থেকে জল নিয়ে তখনকার সময়ে বরজে জল দিত কৃষকরা। আমাদের নিজস্ব বরজ ছিল। এই যে পাখির মুখে পালক নিয়ে বসে থাকার সুন্দর দৃশ্য, এটা ছোট নদীর মধ্যেই দেখা যেত। ছোট নদী ছাড়া এই দৃশ্য আর কোথাও দেখা যাবে না।

প্রশ্ন : কীভাবে আপনি সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হলেন?

উত্তর : আমি চোদ্দো বছর বয়সে পদ্য লিখেছি। কেন পদ্য লিখেছি, তার শুধু এটুকুই মনে আছে— ছন্দ রচনার একটা নেশা হঠাৎ ওই বয়সে পেয়ে বসে। ছন্দ মিলিয়ে পদ সৃষ্টি করা, ছন্দের দুলুনি, ওই বয়সে আমার খুব ভাল লেগেছিল। অন্ত্যানুপ্রাস বা পয়ারের যে অনুপ্রাস সেইটা বা সেই ছন্দটা মেলাতে ভাল লাগছিল বলেই আমি সেগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে লেখা শুরু করি। এটা হচ্ছে ছন্দকে ভালোবেসে ছন্দ সৃষ্টি করতে পারার আনন্দ। সেটাই আমাকে সাহিত্য রচনায় আগ্রহী করে তুলেছিল। আমি ভালবাসতাম গান, গানটা আমি খুবই ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতাম, এটা খুব ভালে মনে আছে। গান ভাল লাগত, ছন্দ ভাল লাগত। ধরো, রাস্তা দিয়ে খাজা হেঁকে যাচ্ছে, তার সুরটা ঠিক আমার কানে এসে পৌঁছয়, ওই সুরটা শুনতে ভাল লাগে। তার ফলে সুরটাকে ভালবেসে, ছন্দকে ভালবেসে, ছন্দ মেলানোর আনন্দে আমি পদ্য লিখেছিলাম। এইভাবেই আমার সাহিত্যে আসা।

কৈশোর এবং যৌবনের কথা যদি বলি, তাহলে বলব, আমার কৈশোর জীবনটা কেটে গেছে পদ্য লিখে। যৌবনে পদার্পণ করেছি পদ্য লিখতে লিখতে। ষোলো বছর বয়সে আমার প্রথম পদ্য ছাপা হয়েছিল 'পয়গম্' নামে একটি পত্রিকায়। 'পয়গম্' ছিল ত্রিসপ্তাহিক একটি সাহিত্য পত্রিকা। সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত। যেহেতু সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হত সেহেতু এর তিনটি বিভাগও ছিল। (১) সবুজ সাথী (২) সাহিত্য সাময়িকী (৩) মহিলামহল। সবুজ সাথী শিশুদের বিভাগ। একটা সাপ্লিমেন্ট ওর সঙ্গে থাকত। সাহিত্য সাময়িকীতে বড়দের লেখা ছাপা হত। এটাতেও সাপ্লিমেন্ট থাকত, যাকে বলা হত ক্রোড়পত্র। আর মহিলামহলে মেয়েদের লেখা ছাপা হত। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, আমি তিনটে বিভাগেই লিখেছি।

ছেলেদের লেখাও মহিলামহলে ছাপা হত। যদি লেখাটা মেয়েদের সম্পর্কে, মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়। আমার লেখা কবিতা প্রথমে সবুজ সাথীতে ছাপা হয়। তার পর দুটো কাগজে ছাপা হয়েছিল। একটা 'কাফেলা', যার প্রকাশক

ছিলেন আবদুল আজিজ। আর দ্বিতীয়টি 'নবজাতক' পত্রিকা। যার সম্পাদক ছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী। এই তিনটি কাগজে আমার লেখা কবিতা প্রথমে ছাপা হয়। এছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কাগজে এবং অন্যান্য জেলার বিভিন্ন কাগজে আমার লেখা ছাপা হয়। ষোলো বছর বয়সে ওই যে লেখা শুরু হল, তার পর চলতে থাকল।

প্রশ্ন : আপনার পড়াশোনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি পড়াশোনা করেছি বিভিন্ন পাঠশালায়। বাবা যেখানে পড়াতেন সেই প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করেছি। গ্রামের পাঠশালাতেও পড়েছি। তার পর হাইস্কুলে পড়ি। হাইস্কুল ছিল ইসলামপুর হাইস্কুল। এটা কিন্তু চক ইসলামপুর। চক শব্দটা আগে ছিল না, পরে যুক্ত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ওই চক ইসলামপুরে ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করি। তার পর কলেজে ভর্তি হই। আমার কলেজ ছিল রাজা কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। কমার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। রাত্রিবেলা কলেজে ক্লাস করতাম। কারণ হল, দিনের বেলা আমি টিউশন পড়াতাম আর সেই টাকা দিয়ে পড়াশোনার খরচ যোগাতাম। দারিদ্রের কারণেই আমি টিউশন পড়াতাম।

প্রশ্ন : হঠাৎ সাহিত্যচর্চা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিলেন কীভাবে? এর প্রকৃত কারণই বা কী ছিল? কত দিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : আমার যৌবনের একটা অংশ, প্রায় এক দশক কেটেছে রাজনীতির পিছনে। ওই যে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আমি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। যে রাজনীতি সমাজ বিপ্লবের কথা বলত। ভোটে পাশ করা নয়, তারা সমাজের আমূল পরিবর্তনের কথা বলত। সেই রাজনীতি করেছি। তখনকার রাজনীতি এখনকার রাজনীতির মতো ছিল না। সে রাজনীতিটা দু'ভাগে করেছি। একটা হচ্ছে নকশালদের আন্দোলন। তখনকার নকশাল মানে চারু মজুমদারের নকশাল। সেই নকশাল দলের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন এসইউসিআই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ বেঁচে ছিলেন। তাঁর লেখা বইপত্র পড়ে, তাঁর বক্তৃতা শুনে বামপন্থী আদর্শের দিকে আমার আকর্ষণ তৈরি হয়। সমাজ বিপ্লব হবে, এটা জেনে তখন একটা দ্বিধাও তৈরি হয়। কে সমাজ বিপ্লব করবে? চারু মজুমদারের দল করবে, না কি শিবদাস ঘোষের দল করবে? এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব আছে আর তার একটা রূপ আছে আমার 'অগ্নিবলাকা' উপন্যাসের মধ্যে।

প্রশ্ন : আপনার গল্প-উপন্যাসে রাজনীতি একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। যেমন 'অগ্নিবলাকা', 'সঈদা বাঈ', 'ভোরের প্রসূতি'। একসময় সরাসরি রাজনীতি করতেন বলেই কি পরে তা লেখায় এল?

উত্তর : অবশ্যই, একেবারেই ঠিক কথা। একসময় সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলেই লেখায় রাজনীতির বিষয়টা ওইভাবে এসেছে।

প্রশ্ন : 'অগ্নিবলাকা', 'ভোরের প্রসূতি' সম্পর্কে কিছু বলুন। দুটোই তো রাজনৈতিক উপন্যাস, সেইসঙ্গে নারীর অসহায়তার কথাও তো আছে।

উত্তর : বামপন্থী রাজনীতি যে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে বিট্রে করেছিল, সেটাই উঠে এসেছে 'ভোরের প্রসূতি' উপন্যাসে। এক অসহায় নারীকে বামপন্থীরা কীভাবে ধোঁকা দিয়েছিল তারই গল্প আছে। তাছাড়া এর সঙ্গে আছে সামন্তবাদীদের অত্যাচার। এটা তখনও ছিল, এখনও আছে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিচ্ছে।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক মতাদর্শ যখন কোন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে তখন ব্যক্তিবিশেষের বা দলীয় মতাদর্শের ক্ষয় দেখা দেয়। আপনার লেখায় তা আছে। আবার আপনি তার মধ্যে থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অথবা চেতনার মুক্তির কথা বলেছেন। আপনি কি এমনই ভাবেন?

উত্তর : অবশ্যই আমি এভাবে ভাবি। এগুলি আমি বিশ্বাস করি। তাই কথাগুলোকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বলছি, আজকে যদি আদর্শে ক্ষয় ধরে থাকে, ধরেছে। কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন চলবে না, মানুষ আবার মূল্যবোধের রাজনীতিতে ফিরবে। সেদিকেই যাচ্ছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে বার বারই যারা দিকভ্রষ্ট হচ্ছে, মানে অবক্ষয়িত হচ্ছে যারা, তাদের আমরা ত্যাগ করছি এবং গ্রহণ করতে চাইছি না। একবার ঘৃণা হয়ে গেলে আর নিতে চাইছি না। সেজন্যই বোঝা যাচ্ছে, মানুষ মূল্যবোধের রাজনীতিটাই চাইছে, আদর্শটাকেই চাইছে, সৎ রাজনীতি চাইছে।

প্রশ্ন : 'সঈদা বাঈ' উপন্যাসে এক হিন্দুকর্মীর ভোট সংগ্রহ, মুর্শিদাবাদের নবাবদের জীবনযাত্রা, সঈদা বাঈয়ের দুর্ভাগ্যের কথাও আছে। আপনি উপন্যাসে নবাবদের জীবনযাপনের যে বর্ণনা দিয়েছেন বাস্তবে কি তাই?

উত্তর : লালবাগকে বলা হত টাঙার শহর। বহরমপুরকে বলা হত রিকশার শহর। যে টাঙা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। নবাবি যানবাহন হল টাঙা। নবাবি কালচারটাই ওই উপন্যাসে উঠে এসেছে। ওখানে যে নায়ককে দেখা যায় পার্টির হয়ে কাজ করতে, সেটা আমি নিজেই। আমারই একটা আত্মপ্রক্ষেপ আছে ওই উপন্যাসের মধ্যে। আমার ভাবনাটাকেই ওভাবে দেখিয়েছি। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ওখানে যে দুর্নীতির কথা আছে, সেটাও সত্য।

প্রশ্ন : আপনার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কার বা কাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? অথবা বলা যেতে পারে সাহিত্য সৃষ্টিতে কে বা কারা আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন?

উত্তর : এখন এই বাহাত্তর বছর বয়সে এসে মনে হয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা প্রথমে ছিল আমার বাবার। বাবাই প্রথম কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন। আর যে গদ্য লেখক হিসেবে তোমরা আমাকে চেন, এই গদ্য রচনার সূত্র মানে প্রেরণা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাহানা। বিয়ের পরই আমি গদ্য রচনা শুরু করি। এই সময় দুটো জিনিস ঘটে। প্রথমত, রাজনীতিতে আমার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে অর্থাৎ বিপ্লব এরা কেউই করবে না— এটা বুঝতে পারি। কেউ করেওনি। শ্রেণি সংগ্রামের মার্কসবাদী তত্ত্বের কথা এরা মুখে বললেও এর সঠিক প্রয়োগ কেউ কোনওদিন করতেই পারেনি। ফলে আমি বুঝতে পারি, এ পথে মানুষের ক্রমমুক্তি হবে না। এদের দ্বারা বিপ্লব হবে না। ফলে রাজনীতি থেকে আমি সরে আসি এবং গদ্য রচনায় হাত দিই।

গদ্য রচনায় যখন মন সবে তৈরি হচ্ছে, যখন সেইভাবে রচনা তৈরি হয়নি, তখন বিয়ে হয়। বিয়ের পর আমি একটা গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম, আধ পাতা সবে লেখা হয়েছে, লেখাটা চৌকির পাশের ফাঁক দিয়ে পড়ে গিয়ে নীচে মাকড়সার জালে আটকে যায়। সাহানা ভোরবেলা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখতে পায়। লেখাটা পড়ে ও বলল, লেখাটা সুন্দর লিখেছ, শেষ করো, থেমে গেলে কেন? তখন আমি খুব উৎসাহিত হই। ভাবি, তাহলে বোধহয় হচ্ছে লেখাটা। আমি যে গদ্য লিখতে পারব তা ভাবতে পারিনি। গদ্য আদৌ হচ্ছে কিনা তাও বুঝতে পারতাম না। গ্রামে কাকেই বা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু ও খুব উৎসাহ দেওয়াতে সেই গল্পটা আমি শেষ করলাম। তার পর এমন একটা রোগ চাপল বলতে পারো, যে আমি পরপর কিছু গল্প লিখে গেলাম। ১৯৮০ সালে আমার বিয়ে হয়। আর ওই সময় থেকেই গদ্য রচনারও শুরু হয়।

প্রশ্ন : আপনার বেশিরভাগ লেখাই তো নায়িকাকেন্দ্রিক। হিন্দু নারী যেমন আছে, মুসলিম নারীও আছে। তবে বেশিরভাগই মুসলিম নারী। এমনটা হওয়ার কারণ কী? আপনি মুসলিম তাই? না কি অন্য কোনও কারণ আছে?

উত্তর : দ্যাখো, মুসলিম জীবনের উপস্থিতি তো বাংলা সাহিত্যে কম। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মুসলিম জীবনের যে উপাদান তা সাহিত্যে আসেনি। সেটা যদি করতে পারা যায় তাহলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হবে। এটা একটা কারণ। মানে সবাই তো করেছিলেন কিন্তু এই দিকগুলো তো উপেক্ষিত। এমনকি ফুলবউয়ের মতো নারী বাংলা সাহিত্যে তো ছিলই না। আমার নায়িকাকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে বেশিরভাগ মুসলিম নারী আর তারাই বেশি নির্যাতিত। তারা মোল্লাতন্ত্রের শিকার। এই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমার সাহিত্যে আসা। যারা সেকুলার মাইন্ডেড তারাই বলত হিন্দু জীবনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের যে ভূমিকা, মুসলিম জীবনের ক্ষেত্রে আপনারও সেই ভূমিকা। কথাটা সহজ করে বললে প্রায় তাই দাঁড়ায়। আমার প্রতিবাদ লাগাতার প্রতিবাদ। এবং এইভাবে অ্যাকটিভ রাজনীতিও কেউ করেনি। জীবন বিপন্ন করে রাজনীতি তো করেইনি। নকশাল আমলে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম সুতাহাটা চৈতন্যপুরে। অমলকান্তি দাস, ওখানকার ডিএম বাসুদেব তিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন : সুতাহাটা চৈতন্যপুর, এই প্রসঙ্গে সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পের কথা মনে পড়ে যায়।

উত্তর : হ্যাঁ, সমরেশ বসুর একটা আলাদা প্রতিবাদ আছে। তবে সমরেশ বসুর সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। আমার মিল ছিল মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে। মহাশ্বেতা যেমন মেয়েদের কথা বলেছেন, ওঁরও লেখা যেমন নায়িকাপ্রধান, তেমনই আমারও। সেদিক থেকে যদি বলি তাহলে আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক। আমার ধারাটা হচ্ছে মহাশ্বেতারই ধারা। মহাশ্বেতা আমার সবচেয়ে পছন্দের লেখিকা। আরও অনেকে লিখেছেন, অনেকে নানা দিক থেকে দেখিয়েছেন। সেগুলোকে আমি গুরুত্বহীন বলছি না, তবে আমি যেগুলো লিখেছি বা যেভাবে দেখিয়েছি তার অনেক দিক রয়েছে। ধরো, কোরান শুধু নয়, বাইবেলও আমার লেখার উপাদান, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট এবং কোরান। শুধু মুসলিম জীবন নয়। 'মরুস্বর্গ' ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর লেখা। মোজেস অর্থাৎ মুসার জন্মের পাঁচশো বছর পরের

পটভূমি নিয়ে লেখা। তখনও কিন্তু জেসাস আসেননি, সেই যে পিরিয়ড, সেটা নিয়েই 'মরুস্বর্গ' লেখা। ফলে, ধর্মতত্ত্ব আমার বিষয়।

অর্থাৎ মূল কথা হল, মুসলিম জীবনের প্রতিফলন তো সাহিত্যে ছিল না। মানে ব্যাপকভাবে ছিল না, যেটা হওয়া উচিত। সেটাই আমি করতে চেয়েছি। আবার শুধু যে মুসলমান জীবন নিয়ে লিখেছি তেমনটাই নয়। হিন্দু, মুসলমান, মুচি সব আছে। যেমন আমার 'চন্দ্রভানু রুইদাস' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে একটা মেয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বহু পুরুষের স্ত্রী হচ্ছে।

প্রশ্ন : 'মরুস্বর্গ' উপন্যাসে আপনি মিথ বা লোককথা ব্যবহার করেছেন। এই যে পুরনো মিথ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্টকে কাহিনির আকার দেওয়া, এই মিথগুলির ব্যবহার ঠিক কীরকম?

উত্তর : মানুষ তার আদিতেই ভাষা সমস্যায় ভুগেছে। সেই ভোগান্তি থেকেই আদি পুস্তক ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রণীত হয়। খুবই বিস্ময়কর একথা যে ভাষাই মানুষকে আদিতে বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্ন করেছে। এই মারাত্মক বিষয়কে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করাটা আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ ঠেকেছিল বলেই আমি 'মরুস্বর্গ' লিখি। আধুনিক উপন্যাস যেকোনও সমস্যারই আদিতে গিয়ে শিকড়ে নেমে তার বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্রতায় পৌঁছতে চায়।

আধুনিক মানুষ বিচ্ছেদপ্রবণ। ভাব দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ধর্ম দিয়ে সে ক্রমাগত নিজেকে ছিন্ন করে চলেছে। মরু ঈশ্বরের সমস্ত ভূমিকা আজ সে নিজেই গ্রহণ করেছে। অথবা কেন সে বিভক্ত হয় তা সে নিজেও জানে না। ভাষা ও ধর্মের এই বিচ্ছেদগত দাহিকাশক্তি কীভাবে বিদীর্ণ করে মানুষকে সেকথাই বলা হয়েছে। আদি রূপ প্রত্যক্ষ করার লোভ থেকেই মরুস্বর্গের জন্ম। এত বিচ্ছেদ ও ছিন্নতার মধ্যেও মানুষ মরুভূমে স্বর্গ গড়ার চেষ্টা করেছিল। সে তার আত্মকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকৃতিকে উদিত করতে চেয়েছিল। মূলত মৌখিক লোকপুরাণই এই কাহিনির দ্রষ্টা, লোকই এই কাহিনি প্রথম মরুমর্তে প্রত্যক্ষ করে। তার পর তা বিশ্বগামী হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে পাল্লাদারি করাটা আদিপুস্তকে যেমন সুলভ, আমার দাদিমার মুখেও তা অনর্গলিত ছিল। মরুস্বর্গের বীজ দাদিমায়ের দেওয়া।

প্রশ্ন : 'ফুলবউ' উপন্যাসটি তো আপনাকে পাঠক সমাজের কাছে যথেষ্ট পরিচিতি এনে দেয়। এখানে মুসলিম সমাজের প্রচলিত কতগুলি সংস্কারের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : আধুনিক জীবন ও মানসিকতার সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের জালে আবদ্ধ যুক্তিহীন প্রথা ও সংস্কারের বিরোধ নিজস্ব এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছি আমি। বিশেষত মুসলমান সমাজের বিবাহপ্রথা, বিচ্ছেদ ও বহুবিবাহের সমস্যাকে। শেষাবধি এ উপন্যাস উত্তীর্ণ নারীমুক্তির বৃহত্তর বিশ্বজনীন এক প্রেক্ষাপটে। এখানে ফুলবউকে মুসলমান বা হিন্দু হিসেবে দেখা হয়নি। দেখা হয়েছে নারী হিসেবে।

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনি মুসলিম নারীদের অবস্থানকে কীভাবে দেখেন এবং তা কীভাবে আপনার লেখায় তা প্রতিফলিত হচ্ছে?

উত্তর : আমি জাতপাত কিছুই মানি না। বর্তমানে যে পরিস্থিতি তার সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ আমার সাহিত্যে রয়েছে। বর্তমানে আমি যে উপন্যাস লিখেছি, 'বাহিরা' নামে, সেটাও নায়িকাপ্রধান। এখানে আমার কথা আছে। কিছু কিছু মেয়েদের দেখছি আমি, যে মেয়েদের জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। মেয়েরা জাগবে। শুধু জাগবে না, জেগে উঠেছে। জেগে গেছে।

প্রশ্ন : মৌলবাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর : মুসলমানরা যদি সত্যি সত্যি ইসলামকে মানে, কোরানকে মানে, রসুলকে মানে তাহলে সে মৌলবাদী হতেই পারে না। ইসলামে মৌলবাদ সম্ভবই নয়। ইসলাম নিজেই হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদেরই একটা সংমিশ্রণ। ইসলাম কখনও কোথাও কোনওদিন কোনও ধর্মকে আক্রমণ করে না। ইরানে বহুদিনের বহু পুরনো ট্রাডিশন অগ্নিপূজা করা, মুসলিমরাই সেই অগ্নিপূজা করে। আসলে প্রকৃত মুসলিমরাই একেবারে উদার। সেটা মোল্লাকে দেখে বোঝা যাবে না। প্রকৃত ইসলাম মৌলবাদ বিরোধী। মুসলিম কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। কিন্তু মুশকিলটা হল এখানে মুসলিমদের মৌলবাদী বলা হচ্ছে। গোঁড়ামিকে মৌলবাদ বলা হচ্ছে। ইসলাম মৌলবাদী ধর্মই নয়। ইসলাম এমন একটা ধর্ম, সাম্যবাদী ধর্ম তো বটেই, তাই ওর মৌলবাদ অসম্ভব। বহুত্ববাদী ধর্ম অর্থাৎ বহুত্ববাদ যার মধ্যে আছে সে মৌলবাদ হবে কী করে? যদিও একধরনের মোল্লা আছে যারা ওটা চেষ্টা করছে। ওটা গোঁড়ামি, মৌলবাদ নয়। ইসলামে মৌলবাদ হবে না।

প্রশ্ন : বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সঙ্গে রাজনীতির চিন্তা-চেতনা বা তার প্রভাব কতটা? এই সম্পর্কের সঙ্গে কি রাজনীতিতে কোনওভাবে যুক্ত?

উত্তর : উগ্র হিন্দুত্ববাদ যাকে বলা হচ্ছে সেটা তো রাজনীতি, সেটা তো ধর্ম নয়। তোমার কী হবে আর কী হবে না, তুমি কী পাবে আর কী পাবে না সব কিন্তু ঠিক করে দেবে রাজনীতি। তোমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে আছে রাজনীতি আর তার সঙ্গে জুড়ে আছে ধর্ম। ধর্ম আর রাজনীতি গলাগলি হয়ে আছে। যে ধর্মের কথা বাদ দিয়ে রাজনীতি বলবে বা রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে ধর্মের কথা বলবে, সে না বলবে রাজনীতি, না বলবে ধর্ম। আজ ধর্ম আর রাজনীতি এমনভাবে সম্পৃক্ত, এমনভাবে মিশে আছে যে একটার থেকে আর একটাকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : 'সুরের সাম্পান' উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাও আছে। সঙ্গীতের ব্যবহার করে এমন একটা উপন্যাসের কথা ভাবলেন কেন?

উত্তর : এই উপন্যাসে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের একটা অপরিগত জায়গাকে আবিষ্কার করা হয়েছে। সেটা একটা মিলনের জায়গা। বলতে চেয়েছি, হিন্দু-মুসলমানের উৎস এক। সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অবদানে তৈরি হয়েছে। যেমন গোপাল। সেই সময়ে গোপাল নামে সত্যি গায়ক ছিল কিন্তু সে হিন্দু না মুসলমান, কেউ জানে না। এই গায়ক গোপালকে অনুসরণ করে উপন্যাসে নায়ক গোপালকে নির্মাণ করেছি। উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান এমনভাবে মিলিত

হয়ে আছে যেখানে জাত বিচার করাই যায় না। ওখানে বিচার হয়েছে সুর বোধের। তুমি হিন্দু না মুসলমান, তার বিচার হয় না। এইরকম একটা জার্মান উপন্যাস ছিল যার শিকড়টা এক। এই উপন্যাসেও তাই দেখানো হয়েছে। সেই অনুসন্ধানটা এই উপন্যাসে আছে। যেটা ওস্তাদ করতে চেয়েছিলেন। একটা অপরিগত অতীত আমাদের আছে যেখানে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়েই রয়েছে। সেই উৎসটাকে ওস্তাদ খুঁজতে চেয়েছিলেন। সঙ্গীতে যারা যুক্ত তাদের উদার হওয়ার কথা। যার ঔদার্য নেই তার সঙ্গীতের মধ্যে না আসাই ভালো। সাজগিরি রাগের কথা উপন্যাসে আছে। সংগীতের ছ'টা রাগের মধ্যে একটা রাগ হচ্ছে ইরাক। আজানের মধ্যে ইরাক রাগের কথা আছে। গান্ধাহার থেকে গান্ধার রাগ, ইয়ামন থেকে ইমন রাগ এসেছে। ইয়ামন আরবের একটা দেশ। এগুলি সহজভাবে ভারতের সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই মিশ্রণটা ধরেই উপন্যাসটি রচিত।

প্রশ্ন : 'স্পর্শের বাইরে' উপন্যাসটিতে মানুষের যৌনতার সঙ্গে পশুর যৌনতা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এটা আপনি কোন ভাবনা থেকে করেছেন?

উত্তর : যারা হুলিয়া নামের পাঁঠাকে পুষত তারা তার যৌন কাঠামোকে ভেঙে নিজের যৌন কাঠামোটাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ওরা তো যৌনতা বিক্রি করত, তা দিয়ে পড়াশোনা করত ঈশানচন্দ্র। কিন্তু ওর নিজের কোনও যৌনজীবন তৈরি হল না। ওই শ্রেণির মানুষকে সভ্যতা, মানে নগরসভ্যতা প্রতিহত করেছে। জায়গা না পাওয়ার উপন্যাস ওটা। পশু যৌনতা বিক্রি করে ঈশানরা যে সংসার চালাত, এটা শুধু গল্পগাছা নয়, সত্যি কথা, আমার চোখে দেখা জিনিস। সভ্যতার কাছে সে একভাবে আত্মগোপন করে ছিল, একভাবে ছদ্মবেশ ধরে ছিল। এই যে অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের সম্পর্ক, সংকট, তা গোটা উপন্যাস জুড়ে আছে। ওর অস্তিত্ব কী? ওর অস্তিত্বের তাৎপর্য খুঁজে চলেছে সারা উপন্যাস ধরে। মানুষ হিসেবে ওর জীবনের কি কোনও মানে আছে? সেটাই খুঁজেছে উপন্যাসে।

প্রশ্ন : 'নরম হৃদয়ের চিহ্ন' উপন্যাসে মূলত আমরা দেখতে পাই ট্রান্সজেন্ডার এবং সমকামিতা এই দুটি বিষয় উপন্যাসে প্রধান। পরবর্তীকালে পৃথিবী জুড়ে এই বিষয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই যে বিষয় আর আপনার উপন্যাস লেখার মাঝখানে অনেক বছর কেটে গেল, এখন আপনার কী মনে হয়?

উত্তর : আমি অনেক সময় অনেক কাজ করেছি যা সেই সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। চল্লিশ বছর আগে 'ফুলবউ' লিখেছি। তার পর 'নরম হৃদয়ের চিহ্ন' লিখেছি। এটা যখন লিখেছি তখন এ বিষয় নিয়ে কেউ লেখেননি। এখানে যেটা আছে— যৌনতার ছাঁচটা এখানে বার বার বদলে যাচ্ছে। যদিও যৌনতার ধারণাগুলো একই থাকেনি, যুগ যুগ ধরে বদলে গেছে। এখন যদি আমি লিখতাম তাহলে আর একটু অন্যরকম লিখতাম। সেটা হচ্ছে যে, যৌনতার প্যাটার্নগুলো যুগ যুগ ধরে বদলাচ্ছে, একরকম থাকে না। ইউরোপের দেশগুলোতে ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর বদলে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের পরস্পর পরস্পরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে। যার ফলে এখন তো সমকামিতা স্বীকৃত, তাদের বিয়ে পর্যন্ত হচ্ছে। যখন আমি 'নরম হৃদয়ের চিহ্ন' উপন্যাসটা লিখি তখন এগুলো হচ্ছিল না। তখন অনেক বাধা ছিল। এখন এগুলো স্বীকৃত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আপনি কি সমকালীন লেখকদের তুলনায় গল্প কম লিখেছেন? আপনার উপন্যাস যতটা চর্চিত, গল্প ততটা চর্চিত নয়। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর : গল্প তুলনায় আমি কম লিখেছি, এটাই ঘটনা। কিন্তু গল্পগুলো গ্রন্থভুক্ত হয়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছচ্ছে না বলে এই গণ্ডগোলটা হয়েছে। মানে, উপন্যাসেরই মতো আমার কাছে গল্পও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : এখন কি কোনও নতুন লেখা লিখছেন? সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : আমি এখন ভাষা ও ধর্মতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা করছি। একসঙ্গে চারটি ভাষা চর্চা করছি। হিন্দু, উর্দু, আরবি, পার্সি এবং ইংরেজি তো আছেই। এখনই কিছু লিখছি না।